ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

তরুণ সরকার

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-98154-8-8

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি : অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
তরুণ সরকার

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে মুদ্রিত
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Oitijjo O Sonskriti : Onusondhani Protibedon
by Tarun Sarkar
First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

পঙ্কজ কান্তি দেবনাথ
ছোট মামা
যিনি সন্তানস্নেহে আমাকে লালন-পালন করেছেন
যাঁর অবাধ প্রশ্রয়ে কৈশোরে লেখালেখিতে
যুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

সূ চি প ত্র

আশীর্বাণী ০৯

মুক্তিযুদ্ধের অরক্ষিত দলিল ও ইতিহাস প্রণয়ন ১১

বাংলাদেশে ভাষা ৪০

ঢাকার সিনেমা হল ৭৬

বাংলাদেশে শেখ ফরিদ ১০৫

বড় কাটরার শিলালিপির সন্ধান ১৪৩

ঐতিহ্যবাহী কুস্তির অতীত ও বর্তমান ১৫২

নির্ঘণ্ট ১৯৩

আ শী র্বা ণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তরুণ সরকার তীক্ষ্ণধী প্রতিভার অধিকারী একজন সংবাদকর্মীরূপে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদকদের সংগঠনের নেতৃত্ব করেছেন। সহপাঠীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। পরে নবীন সাংবাদিক হিসাবে আমাদের সঙ্গে পেশাদারি কাজ করার সময় দেখেছি ওঁর আগ্রহ স্বদেশ, ইতিহাস, সাধারণ মানুষ, জন-জাতি, সংস্কৃতি, নদী, অরণ্য, নগর, স্থাপত্য, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতিতে গভীরভাবে নিবদ্ধ। তুলনায় দৈনন্দিন সাংবাদিকতায় মনোযোগ ছিল কম। এ পেশার চাকরিটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উদ্যম না হারিয়ে তিনি আগ্রহের বিষয়ে অনুসন্ধান ও ফ্রিলান্স সাংবাদিকতায় নিরত আছেন।

এ নাতিদীর্ঘ গ্রন্থটিতে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ সরকারের এমন কয়েকটি প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে। প্রতিবেদনগুলি সতত সংবাদমাধ্যম-সুলভ তাৎক্ষণিকতার অধিক মূল্য ধারণ করে। লেখাগুলি সংকলনে ধারাবাহিকতার চেয়ে বিষয়বৈচিত্র্যে মনোযোগ বেশি, যা পাঠককে বিভিন্ন স্বাদ দিতে পারে। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে ২০০১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে সংবাদ-মাধ্যম ও সাংবাদিকতায় উথাল-পাথাল পরিবর্তন ঘটছে। সমাজ-বিকাশের গতির চেয়েও এ পরিবর্তনের মূল ও বড় কারণ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। প্রযুক্তির যেন ঐন্দ্রজালিক রূপান্তর ঘটছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা সংবাদপত্রকে ছাপানো কাগজের গণ্ডি ছেড়ে কম্পিউটার ও সেলফোনের স্ফটিক-পর্দায় পাঠযোগ্য করেছে এবং দৈনিক-সাপ্তাহিক

প্রভৃতি সাময়িক প্রকাশনার পরিবর্তে অবিরাম প্রকাশনা করে তুলেছে। আবার একই সঙ্গে মাল্টিমিডিয়া বা পাঠ্য, শ্রাব্য ও দৃশ্য করেছে যা আগে সংবাদপত্র, বেতারযন্ত্র ও টেলিভিশনে বিভক্ত ছিল। এ পরিবর্তনের ফলে গ্রাহকের চাহিদায় বৈচিত্র্য এসেছে, দেওয়ারও সুযোগ ঘটেছে। অনলাইনে অবিরাম ঘটনার খবর তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় এবং পরে খবরের গভীরতাসহ বিশ্লেষণাত্মক ও গবেষণাধর্মী দীর্ঘ প্রতিবেদন দেওয়া যায়। তরুণ সরকারের প্রতিবেদনগুলিতে আমরা গবেষণার আঁচ পাবো। বইটি পাঠকদের তৃপ্তি দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং স্বাধীন সাংবাদিকতায় তরুণ সরকারের আরও সাফল্য কামনা করি।

মোজাম্মেল হোসেন
ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের অরক্ষিত দলিল ও ইতিহাস প্রণয়ন

▪ যুদ্ধ শেষ : শুরু হয় ইতিহাস লেখার ইতিহাস

১৯৭২ সাল। সময়টা তখন ছিল বেশ অস্থির। যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু দেশকে রেখে গেছে বিধ্বস্ত করে। সড়ক ভাঙা, সেতু ভাঙা, ভাঙা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা। চারদিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই শুরু হয় নতুন করে দেশ গড়ার আয়োজন। সীমিত সম্পদ আর অল্প অর্থ নিয়ে সরকার গ্রহণ করে দেশ গড়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা।

যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশে প্রথম ছয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের দলিল ও উপকরণ সংরক্ষণ এবং ইতিহাস লেখার কোনো সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথা জানা যায় না। তবে বুদ্ধিজীবী বিশেষ করে ইতিহাসবিদগণ মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংরক্ষণ ও ইতিহাস লেখার ব্যাপারে জনমত গঠন করতে থাকেন। '৭২-এর সেই ব্যস্ত দিনগুলোতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের উচ্চপর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে। তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আদেশে গঠিত হয় 'জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা পরিষদ'। মন্ত্রণালয়ের সচিব

এ এস নূর মোহাম্মদের এক পত্রে পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, (১) বালাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা এক গৌরবোজ্জ্বল মহাকাব্য। আদর্শের প্রগাঢ়তায়, ত্যাগের ঐশ্বর্যে ও নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায় এ সংগ্রাম উদ্দীপ্ত। (২) এ সংগ্রামের ইতিহাস বাঙালি জাতির শাশ্বত প্রেরণার উৎস। সরকার মনে করে, অনতিবিলম্বে এ ইতিহাস রচনার কাজে হাত না দিলে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বহু তথ্য বিকৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাবে। এ জন্য এ আন্দোলনের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস অনতিবিলম্বে রচনার প্রয়োজন। (৩) এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশনার জন্য সরকার নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন : ড. মযহারুল ইসলাম, সভাপতি (পদাধিকার বলে) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি। সদস্য হচ্ছেন (১) ড. এ এফ সালাউদ্দিন আহমদ, (২) ড. মফিজুল্লাহ কবীর, (৩) ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, (৪) ড. আনিসুজ্জামান, (৫) ড. নীলিমা ইব্রাহিম, (৬) ড. কাজী আবদুল মান্নান, (৬) আ কা মো যাকারিয়া, (৮) অধ্যাপক আবুল ফজল, (৯) সিকান্দার আবু জাফর, (১০) বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, (১১) ড. সফর আলী আকন্দ, (১২) আবু জাফর।

একই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, সদস্যদের কার্যকাল হবে এক বছর। পরিষদের ৪ জন সদস্য যথাক্রমে ড. এ এফ সালাউদ্দিন আহমদ, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, অধ্যাপক আবুল ফজল ও সিকান্দার আবু জাফর ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য অপারগতা প্রকাশ করে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে পরিষদের সভা থেকে ৪টি শূন্যপদে স্বদেশরঞ্জন বসু, ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী, নুর মোহাম্মদ মিয়া ও কে জি মুস্তাফাকে সদস্য নিযুক্তির জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পদত্যাগকারী ৪ জনের ৩ জনই এখন জীবিত নেই।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক এ এফ সালাউদ্দিন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। রাজশাহীতে থেকে কাজ করা সম্ভব নয় বলে পদত্যাগ করি। তিনি

আরও বলেন, 'বাংলা একাডেমির নিজস্ব অনেক কাজ আছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার মতো একটি বিরাট কাজ বাংলা একাডেমিকে দেওয়া ঠিক হয়নি। জাতির ইতিহাস গবেষণা করার জন্য আলাদা একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এ ধরনের কাজ করা যেতে পারত।

▪ ইতিহাস রচনা পরিষদ : ইতিহাস নয় তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহে সীমাবদ্ধ

বাংলা একাডেমিকে কেন্দ্র করেই তখন পরিষদ যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা প্রকল্পে তথ্য, উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য ৩৪ জনকে গবেষণা সহায়ক ও তথ্য সংগ্রাহক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের তৎকালীন ৪টি বিভাগের প্রতিটিতে ৫ সদস্যবিশিষ্ট দল গঠন করা হয়। প্রকল্পের সভাপতি ড. মযহারুল ইসলাম ২০০০-কে জানান, প্রকল্পের এক বছরের মেয়াদকালে কর্মীরা সারা দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করে।

১৯৭৩ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর সরকার প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করেনি। পরিষদের দায়িত্ব তখন বাংলা একাডেমির ওপর ন্যস্ত করা হয়। বাংলা একাডেমির তৎকালীন কর্মকর্তারা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ নামে তারা নতুন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইতিহাস রচনার জন্য পরিষদের দায়িত্ব নতুন এ বিভাগের ওপর অর্পিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার ১৯৯১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : সমস্যা ও*

সম্ভাবনা শীর্ষক এক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়,

> বাংলা একাডেমির উদ্যোগটি প্রধানত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেনি। প্রবন্ধে আরও বলা হয়, অদল বদল ও পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত পরিষদের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি। তবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিষদ বেশ কিছু অগ্রগতি লাভ করে। তাদের সংগৃহীত তথ্যাবলীর মধ্যে ছিল (১) মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সমাজের সর্বস্তরের জনগণের ৪ হাজার ১৪১টি সাক্ষাৎকার, (২) মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্রবাহিনীর সৈনিক অফিসারদের ৩৫০টি সাক্ষাৎকার, (৩) নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মী ইত্যাদি ৪৯৫টি সাক্ষাৎকার (৪) মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত আলোকচিত্র ৫১১টি।

প্রকল্পের সভাপতি ড. মযহারুল ইসলাম ২০০০-কে জানান, শুধু তথ্য নয়, যুদ্ধের বিভিন্ন উপকরণও একাডেমি তখন সংগ্রহ করেছিল। দেশের বিভিন্ন বধ্যভূমি থেকে ১০৭ জন শহীদের মাথার খুলি সংগ্রহ করেছিল।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো ইতিহাস রচনা প্রকল্পেও এর প্রভাব পড়ে। '৭৫-এর অক্টোবরে বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রকল্প। সঙ্গে সঙ্গে একাডেমির ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার প্রথম উদ্যোগের এভাবেই অপমৃত্যু হয়।

▪ ইতিহাস লেখার দ্বিতীয় উদ্যোগ ইতিহাস থেকে দলিলপত্র

'৭৫-এ ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে ওএসডি করায় তখন তিনি বেকার এবং তাঁর

বাসা ছিল ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ড. কে এম মোহসীন জানান, তিনি হাসান হাফিজুর রহমানের কাছে শুনেছেন, প্রাতঃভ্রমণের সময় জিয়াউর রহমানের সঙ্গে প্রায় তার দেখা হতো। একদিন হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দেখা হলে কুশল বিনিময়ের পর জিয়াউর রহমান তাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার প্রস্তাব দেন এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন। এরপর হাসান হাফিজুর রহমান একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করে জমা দেন। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে হাসান হাফিজুর রহমানকে পরিচালক করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীরকে চেয়ারম্যান করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন অধ্যাপক এ এফ সালাউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস বিভাগ ঢা. বি.), অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (বাংলা বিভাগ ঢা. বি.) ড. সফর আলী আকন্দ (পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রা. বি.), ড. কে এম মোহসীন (ইতিহাস বিভাগ ঢা. বি.), ড. শামসুল হুদা হারুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢা. বি.), ড. কে এম করিম (পরিচালক ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভ), ড. এনামুল হক (জাতীয় জাদুঘর) ও হাসান হাফিজুর রহমান।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্য প্রতিষ্ঠিত এ প্রকল্পের প্রথম সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পালটে যায় প্রকল্পের চরিত্র ও কাজ। প্রকল্পের অন্যতম সদস্যবিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় গঠিত ৩টি জাতীয় কমিটিরই সদস্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জানান, 'প্রকল্পের প্রথম সভায় ইতিহাস লেখার পরিবর্তে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সংগ্রহ ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে জানা যায়, একটি সরকারি প্রকল্প থেকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ

ইতিহাস রচনা করা যাবে কি না, এ নিয়ে সেদিন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এ জন্য তারা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি জটিলতাও দেখা দিতে পারে। তত দিনে প্রজ্ঞাপন হয়ে গেছে, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল ইতোমধ্যে অনুমোদনও দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কলা অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ড. কে এম মোহসীন জানান, হাসান হাফিজুর রহমান তখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কাছে গিয়ে ইতিহাস লেখার পরিবর্তে দলিলপত্র প্রকাশের বিষয়টি তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জানিয়ে দেন, প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের দরকার নেই। এ ক্ষেত্রে ঝামেলা হবে। প্রকল্পের কর্মকর্তারা যেন তাদের পরিকল্পনামতো কাজ চালিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেবে না। ফলে দূর হয়ে যায় আইনি জটিলতার শঙ্কা। প্রকল্পের কার্যকাল স্থির হয়েছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এবং গ্রন্থ প্রকাশসহ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয় ৭২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাড়িকে কেন্দ্র করে শুরু হয় প্রকল্পের কাজ। স্বাধীনতার ইতিহাস রচনাবিষয়ক পূর্ব-প্রকল্পের কর্মী সুকুমার বিশ্বাস তখন বাংলা একাডেমিতে কর্মরত। তিনি খণ্ডকালীন কর্মী হিসাবে যুক্ত হন প্রকল্পে। সৈয়দ আল ইমামুর রশিদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা ও ওয়াহিদুল হক—এ ৪ তরুণকে নিয়োগ দেওয়া হয় পূর্ণকালীন গবেষণা কর্মকর্তা হিসাবে। এদের প্রথম জন বাংলা বিভাগের এবং শেষের ৩ জন ইতিহাস বিভাগের সাবেক মেধাবী ছাত্র। এ ছাড়াও ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ইতিহাস বিভাগের তরুণ শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্ররা খণ্ডকালীন হিসাবে কাজ করেন প্রকল্পে।

শুরু হয় কাজ। বলা যায়, যেন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রকল্পের কর্মকর্তারা। প্রকল্পের কর্মকর্তা শাহ আহমদ রেজার মতে, সীমিত সময় ও সীমিত অর্থসহ নানান সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু প্রকল্পের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আবেগ জড়িত ছিল। ফলে নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও

সততা নিয়ে কাজ করেছি। অধিকাংশ দলিলই সংগ্রহ হয়েছে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। দেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তিনি ছুটে গেছেন বার বার। দলিল সংগ্রহের জন্য তিনি বিদেশেও গেছেন। আফসান চৌধুরী জানান, সরকার থেকে যেকোনো অফিসে গিয়ে দলিল সংগ্রহ করার অনুমতি পেয়েছিলেন তারা। বিভিন্ন অফিসে গিয়ে বার বার ধরনা দিয়েছেন দলিলের জন্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের কাছে পাঠানো হয় কয়েক হাজার প্রশ্নমালা।

প্রকল্পের দলিল ১৬ খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম খণ্ডে পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮), দ্বিতীয় খণ্ডে পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১), তৃতীয় খণ্ডে মুজিবনগর : প্রশাসন, চতুর্থ খণ্ডে মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা, পঞ্চম খণ্ডে মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম, ষষ্ঠ খণ্ডে মুজিবনগর : গণমাধ্যম, সপ্তম খণ্ডে পাকিস্তানি দলিলপত্র : সরকারি ও বেসরকারি, অষ্টম খণ্ডে গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, নবম খণ্ডে সশস্ত্র সংগ্রাম (১), দশম খণ্ডে সশস্ত্র সংগ্রাম (২), একাদশ খণ্ডে সশস্ত্র সংগ্রাম (৩), দ্বাদশ খণ্ডে বিদেশি প্রতিক্রিয়া : ভারত, ত্রয়োদশ খণ্ডে বিদেশি প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র, চতুর্দশ খণ্ডে বিশ্বজনমত, পঞ্চদশ খণ্ডে সাক্ষাৎকার এবং ষোড়শ খণ্ডে কালপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ১৬ খণ্ডে ৭ হাজার ২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু সংগৃহীত দলিলপত্রের পরিমাণ দেখে প্রকল্পের কর্মকর্তারা তাদের পরিকল্পনার একটু পরিবর্তন করেন। পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিখণ্ডে ৯ শত পৃষ্ঠা করে ১৫ হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে সংগৃহীত দলিলপত্র মুদ্রণ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়।

কেমন ছিল পরিবেশ ও পরিস্থিতি—এ প্রশ্ন করা হয়েছিল সংশ্লিষ্টদের। প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জানান,

কাজটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়েছে, তা নয়। তখন সরকারের চাপ ছিল। গোয়েন্দাদের এক রকম নজরদারি ছিল। প্রকল্পের কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ী ছিল না। ফলে তারাও একরকম চাপ অনুভব করতেন। গবেষণা কর্মকর্তা আফসান চৌধুরী বলেন, প্রকল্পে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবনে আর কোথাও এমন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না পেলে বঙ্গবন্ধুর '৭১-এ ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা দলিলে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পেতাম না।

প্রতিমাসে একবার বা দুবার প্রামাণ্যকরণ কমিটির সভা হতো। সভায় দলিল প্রকাশের জন্য অনুমোদন করা হতো। সভার আগে গবেষণা কর্মকর্তারা দলিল নির্বাচন করে রাখতেন। সৈয়দ আল ইমামুর রশিদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা, ওয়াহিদুল হক, সুকুমার বিশ্বাস ও তাইবুল হাসান খান দলিল নির্বাচন করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সভায় উপস্থাপন করতেন।

১৯৮৩ সালে মারা যান হাসান হাফিজুর রহমান। ততদিনে প্রকল্পের কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। ১৫ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রায় প্রস্তুত। বেশ কয়েক খণ্ড ছাপাও হয়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রকল্পের পরিচালক নিযুক্ত হন প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্য ড. কে এম মোহসীন। ২০০০-কে তিনি জানান, কয়েক খণ্ড প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের মনে আস্থা জন্মে। এ সময় প্রচুর দলিল আসতে থাকে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল এ সময় আমাদের হাতে আসে যা প্রকাশ করা জরুরি বলে মনে হয়। এ অবস্থায় ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে ১৫ খণ্ডের অতিরিক্ত আরও ৬ খণ্ড ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রকল্পের প্রামাণ্যকরণ কমিটির পক্ষ থেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আরও অন্তত ৬ খণ্ড ছাপানোর জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়। এতে এক খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত ছবি ও ছবির বর্ণনা এবং অপর খণ্ডগুলোতে বিলম্বে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং দলিলের বর্ণনামূলক ক্যাটালগ ছাপানো হবে বলা হয়। অনুমোদিত হয় এ প্রস্তাব এবং এ জন্য বরাদ্দ হয় ৪৪ লক্ষ টাকা।

▪ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় : এ এক আজব কুদরতি

প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ১৯৮৫ সালে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান *চরমপত্র*-এর লেখক ও পাঠক এম আর আখতার মুকুল তখন সেখানে চাকরি করতেন। সরকার প্রকল্পের পরিচালক পদে নিয়োগ দেন এম আর আখতার মুকুলকে। প্রকল্পের প্রামাণ্যকরণ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীর মারা যান ১৯৮৪ সালে। এম আর আখতার মুকুল দায়িত্ব নিয়ে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সভাপতি পদে নিয়োগ দেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে। প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানসহ বেশ কয়েকজন পদত্যাগ করেন।

প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকাল ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় এবং পরে আরও ১ বছর বাড়ানো হয়। এ সময় অ্যালবামসহ মোট ৭ খণ্ড প্রকাশের জন্য তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয় ৪৩ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৩ বছরে তারা শুধু একটি অ্যালবাম প্রকাশ করে। এ অ্যালবামটি শুরু হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের একটি ছবি দিয়ে এবং শেষের ছবিটিও ছিল তার। এ ছাড়া এরশাদের আরও ৭টি আলোকচিত্র মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অ্যালবামে স্থান পায়।

▪ দলিলের ভবিষ্যৎ ও বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থার কথা

প্রকল্পের কর্মকর্তারা ৩ লক্ষ পৃষ্ঠার দলিল সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে মাত্র ১৩ হাজার পৃষ্ঠার (সাড়ে ৩ ভাগ) দলিল নিয়ে ১৫ খণ্ড

প্রকাশ করা হয়েছিল। '৮০-এর পর থেকে প্রকল্পের কর্মকর্তারা সংগৃহীত দলিলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে থাকেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, এ সময় প্রকল্পের প্রামাণ্যকরণ কমিটি ও হাসান হাফিজুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে থাকেন। প্রকল্পের সাবেক পরিচালক ড. কে এম মোহসীন জানান, এ লক্ষ্যে তারা উচ্চতর পর্যায়েও যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি আরও জানান, আমরা ধারণা করেছিলাম, দলিলগুলোর সুষ্ঠু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হলে হারিয়ে বা চুরি হয়ে যাবে।

১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল হাসান হাফিজুর রহমান মারা যাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে বুদ্ধিজীবী ও সরকারি মহলেও চিন্তাভাবনা শুরু হয়। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার* ১৯৯১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : সমস্যা ও সম্ভাবনা* শীর্ষক এক গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. মজিদ খান একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেন, যাতে বলা হয়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পকে ভিত্তি করে 'বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা' নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্থায়ী এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। সংস্থাটির পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন অনুদানের প্রস্তাবও এতে যুক্ত ছিল। সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা পরিচালনা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সংস্থা দেশবাসীকে সচেতন করে তুলবে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় অনেকেই এ ব্যাপারে আশান্বিত হন। ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি তথ্য দলিল জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। পরম যত্নে এগুলো সংরক্ষিত হওয়া উচিত। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা এবং তা রচনার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ, তথ্যের সংযোজন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা ও প্রকাশের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি তিনি গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজকে ত্বরান্বিত করতেও নির্দেশ দেন। ১৯৮৫ সালের ৬ জানুয়ারি তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী ড. মজিদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক সভা। এতে তথ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির অর্থ উপদেষ্টা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবরা অংশ নিয়েছিলেন। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পকে ভিত্তি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা' নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়, (ক) সংস্থা গঠন ও তার কাজ শুরু করার উদ্দেশ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন করবে, (খ) পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ও অধ্যাদেশে সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ থাকবে, (গ) তথ্য মন্ত্রণালয় চলমান ইতিহাস প্রকল্পের অসমাপ্ত ও সম্ভাব্য কার্যক্রম এবং কার্যরত জনশক্তির বিবরণসহ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে, (ঘ) অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত প্রস্তাব ও অধ্যাদেশ পরীক্ষার পর মন্তব্যসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠাবে (ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় খসড়া অধ্যাদেশটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করবে এবং (চ) অনুমোদিত হওয়ার পর 'বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা' স্বাধীনতাযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ এবং জনশক্তিসহ যাবতীয় সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

মন্ত্রণালয়ে ফাইল আটকে থাকে বলে দুর্নাম আছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রকল্পটি ছিল এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে তা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতি তা নীতিগতভাবে অনুমোদন করে আইনগত দিক পরীক্ষার জন্য আইনমন্ত্রীর কাছে পাঠান। এ পর্যন্তই জানা যায়। জাতির ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্যে স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর কোনো তথ্য জানা যায় না।

▪ একটি প্রকল্পের মৃত্যু : কারণ অজ্ঞাত

ইতিহাস সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে বেশ এগিয়ে যায়। কিন্তু এরপর অজ্ঞাত কারণে সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ আর অগ্রসর হয়নি। কেন প্রতিষ্ঠা হয়নি ইতিহাস গবেষণা সংস্থা—এ বিষয়টি জানার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা যায়নি। বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছে। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার* ১৯৯১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা : সমস্যা ও সম্ভাবনা* শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়,

> প্রকল্প দলিলের ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে, ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইতিহাস প্রকল্পকে অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিচালকের অসহযোগিতার জন্য ইতিহাসসংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো তার সহযোগিতা সময়মতো চিঠির জবাব পাননি। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৮৭ সালের ২৬ অক্টোবর এবং ২৪ ডিসেম্বর প্রকল্প পরিচালকের কাছে দুটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে যে কাজগুলো পরবর্তী পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হবে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবনা জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে

প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক অবশ্য তেমন কোনো যোগাযোগের চেষ্টা করেননি এবং ইতিহাস গবেষণা গঠনের সপক্ষে কোনো পদক্ষেপও নেননি। ১৯৮৮ সালের ১৯ জুন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে তথ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় পর্যালোচনাকালে তথ্য সচিব আ ন ম ইউসুফ বলেন, পরিচালককে তিনি বলেছিলেন, তার দিক থেকে দু'এক লাইনের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানো হলে তথ্য মন্ত্রণালয় ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গঠনের কাজটি বাস্তবায়ন হতে পারত।

সরকারি কর্তারা এভাবেই বাংলাদেশ সংস্থা প্রতিষ্ঠা না হওয়ার কারণ হিসাবে এম আর আখতার মুকুলকে দায়ী করে তাদের দায়িত্ব সেরেছেন।

এ ব্যাপারে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. মজিদ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ ছাড়াও এককালীন অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চলে আসার পর ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে ভাটা পড়ে এবং পরে আর বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার পরে যারা এসেছিল, তারা এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি। আর সচিব, যুগ্ম সচিবরা নিজেদের স্বার্থ না থাকলে কোনো কাজ অগ্রসর করতে চায় না।

ড. মজিদ খান আরও জানান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ইতিহাস গবেষণা সংস্থা ও এশিয়াটিক সোসাইটিকে এককালীন অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ এককালীন অনুদানের লভ্যাংশ দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দৈনন্দিন খরচ চালাতে পারত। এর মধ্যে বিআইডিএসের ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। এশিয়াটিক সোসাইটির ক্ষেত্রে আংশিক সফল এবং ইতিহাস গবেষণা সংস্থার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি।

এ ব্যাপারে প্রকল্পের সাবেক পরিচালক এম আর আখতার মুকুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রায় ১৪/১৫ বছর আগের কথা। ওসব বিষয় আমার এখন খেয়ালে নেই। তার অসহযোগিতার কারণে ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। সরকার ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের এ অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মানুষ তো কত কথাই বলতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ইতিহাসবিদ মত প্রকাশ করেন, স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠা না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ দেশের পেশাদার ইতিহাসবিদদের দুটি সংগঠন বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের মধ্যে বিরোধ। বর্তমান সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা সমিতির সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা পরিষদের সদস্য। '৯০ এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি শ্বিবিদ্যালয়ের ইতিহাস-সম্পর্কিত সকল বিভাগের সমন্বয়ে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবি জানালে এ বিরোধ প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। ইসলামের ইতিহাস বিভাগ ও দেশের ইসলামপন্থি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করায় তখন সমিতি বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। তবে বিরোধের কারণে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান না হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া। তিনি জানান, সমিতি ও পরিষদের বিরোধ নয়, সরকারি ব্যক্তিদের অনিচ্ছার কারণে ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তিনি আরও জানান, ইতিহাস সমিতি স্বাধীনতার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে, বিভিন্ন সময়ে সেমিনার-কর্মশালায় একটি স্থায়ী ইতিহাস গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে।

ইতিহাস সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে নেপথ্যে থেকে কাজ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ এফ সালাউদ্দিন

আহমদ। তাঁর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যারা ইতিহাসকে ভয় পায় তারাই ইতিহাস সংস্থা প্রতিষ্ঠা হতে দেয়নি। ওরা জানে ইতিহাসচর্চা করা হলে তাদের নোংরা চেহারা বেরিয়ে পড়বে।

▪ দলিলগুলো সব গেল কোথায়

সেগুনবাগিচার হোটেল চট্টগ্রামের বিপরীতে একটি ৩ তলা ভবনের ২য় তলায় ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের কার্যালয়। প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা আফসান চৌধুরী জানান, প্রকল্পের কার্যালয়ের ৫টি কক্ষের ৪টিতেই ছিল দলিলপত্র। একপর্যায়ে এত দলিলপত্র আসতে থাকে যে, আমরা রাখার জায়গা পাচ্ছিলাম না। ফলে তখন দলিলপত্র নিতে আমরা আর তেমন আগ্রহী ছিলাম না। প্রকল্পের সাবেক পরিচালক ড. কে এম মোহসীন জানান, প্রথম প্রথম মানুষ দলিল দিতে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু কয়েক খণ্ড প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর মানুষের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দলিল জমা দিতে থাকে।

আফসান চৌধুরী জানান, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশনের কয়েক শত ফাইল আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। এ সংস্থাটি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাহিত্যিকদের টাকা দিতো, তাদের গতিবিধি লক্ষ রাখত। কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের একটি চেক বই আমরা পেয়েছিলাম। এ ছাড়াও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন, বুদ্ধিজীবীদের গতিবিধি, বামপন্থিদের তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশনের রিপোর্ট প্রকল্প সংগ্রহ করেছিল। প্রকল্পের কর্মকর্তারা জানান, মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও বিদেশি প্রচুর দলিল তারা সংগ্রহ করেছিল।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জানান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল